পরিবেশ বিদ্যা

পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

সম্পাদক

ড. রূপা দাশগুপ্ত

সহ সম্পাদক

পার্থপ্রতিম প্রামানিক, ড. বিপ্লব দত্ত

ড. শত্রুঘ্ন কাহার, অভিষেক মুসিব

DEBRA THANA SAHID KSHUDIRAM SMRITI MAHAVIDYALAYA

পরিবেশবিদ্যা: পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

সম্পাদক

ড. রূপা দাশগুপ্ত

সহসম্পাদক

পার্থপ্রতিম প্রামানিক

ড. বিপ্লব দত্ত

ড. শত্রুঘ্ন কাহার

অভিষেক মুসিব

ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

গঙ্গারামচক, চকশ্যামপুর, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর— ৭২১১২৪

Paribeshbidya: Paryabekshan O Pryalochana (পরিবেশবিদ্যা: পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা) edited by Dr. Rupa Dasguta & others

© Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyala

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০২৪

প্রচ্ছদ: সমরেশ সেন

পেজ সেট-আপ: ড.বিপ্লব দত্ত
কম্পোজ: সমরেশ সেন, মেদিনীপুর

দাম: ৩০০ টাকা

ISBN : 978-81-969027-5-9

ড. রূপা দাশগুপ্ত, প্রিন্সিপ্যাল, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়-এর পক্ষে গঙ্গারামচক, চকশ্যামপুর, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর— ৭২১১২৪ থেকে প্রকাশিত

বিষয়সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা নং
সম্পাদকীয়		১-৩
পরিবেশবিদ্যাচর্চার নানা দিক ও পর্যায়	সৌম্যকান্তি ঘোষ	৪-১০
প্রকৃতির স্থায়ী উন্নয়ন	সঞ্জিত কুমার মণ্ডল	১১-১৬
বাস্তুতন্ত্রে গঠন ও কার্যকারিতা	মৈত্রেয়ী পন্ডা	১৭-২২
বাস্তুতন্ত্র- ধারণা ও বন বাস্তুতন্ত্র	মানস চক্রবর্তী	২৩-২৮
তৃণভূমি অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র	বিপ্লব মজুমদার	২৯-৩২
মৃত্তিকা ক্ষয় ও সংরক্ষন	সুজাতা মাইতি	৩৩-৫৩
মরুকরণ: - বিশ্বব্যাপী একটি সমস্যা	পার্থ প্রতিম প্রামানিক	৫৪-৬২
বনচ্ছেদনের কারণ ও পরিবেশের ওপর প্রভাব	অভিষেক মুসিব	৬৩-৭০
বনচ্ছেদন: কারণ ও জীববৈচিত্র্যের উপর প্রভাব	দশরথ হালদার	৭১-৭৭
জনজাতি ও উপজাতির উপর বনচ্ছেদনের প্রভাব	সুদীপ্তা মাহাত	৭৮-৮৬
জল: ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ জলের অত্যধিক ব্যবহার ও অপচয়	ড. গোবিন্দ দাস	৮৭-৯৪
পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দুই দিক বন্যা ও খরা	নিবেদিতা অধিকারী	৯৫-১০৩
শক্তি সম্পদ- পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও অপুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি	সুব্রত কুমার সেন	১০৪-১১০
বিকল্প শক্তিসম্পদ	মানিক দাস	১১১-১১৭
ভারতের স্থানীয় ও বিপন্ন প্রজাতি সমূহ	সন্তু ঘোড়াই	১১৮-১২৩
জীববৈচিত্র্যের সংকট: বাসস্থানের ক্ষতি, বন্যপ্রাণী শিকার, মানুষ বন্যপ্রাণী সংঘাত, জৈবিক আক্রমণ	অঞ্জলী জানা সেনাপতি	১২৪-১৩৩
বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্য : পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, নান্দনিক এবং তথ্যগত মান অন্বেষণ	দেবদুলাল মান্না	১৩৪-১৩৭

পরিবেশ দূষণ ও তার কারণ, প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ	সোমা মিশ্র	১৩৮-১৪৫
ভারতে জল দূষণ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব	শুভেন্দু জানা	১৪৬-১৫১
জীবজগতের উপর মাটি দূষণের প্রভাব এবং এর থেকে মুক্তির উপায়	ড. মৃণাল কান্তি সরেন	১৫২-১৫৭
শব্দ দূষণ: কারণ ও প্রতিকার	সম্পা দে	১৫৮-১৬৩
পারমাণবিক দুর্যোগ এবং মানব স্বাস্থ্যের ঝুঁকি	প্রীতম পাত্র	১৬৪-১৬৮
ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা	ড. বিপ্লব দত্ত	১৬৯-১৭৬
বিশ্ব-উষ্ণায়ন এবং কৃষি ও মানব সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব	দেবলীনা দে	১৭৭-১৭৯
ওজোন স্তরের অবক্ষয় এবং কৃষি ও মানব সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব	আশিষ রানা	১৮০-১৮৪
অ্যাসিড বৃষ্টি: মানব সম্প্রদায় এবং কৃষির উপর প্রভাব	রবিশঙ্কর প্রামাণিক	১৮৫-১৯০
পরিবেশ আইন: পরিবেশ সুরক্ষা আইন	ড. মিঠুন ব্যানার্জী	১৯১-১৯৯
বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন	মিলন মাজী	২০০-২০৪
মানব জনসংখ্যা বৃদ্ধি: পরিবেশ, মানব স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের উপর প্রভাব	তনুশ্রী মাইতি	২০৫-২১৯
বন্যার কারণ ও প্রতিরোধ	বীতশোক সিংহ	২২০-২২৩
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: ভূমিধস	ববিতা ভুঁইয়া	২২৪-২৩৩
চিপকো আন্দোলন	মন্টু সাহু	২৩৪-২৩৬
সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন	অর্পিতা ত্রিপাঠী	২৩৭-২৪০
বিশনয় সম্প্রদায় ও পরিবেশ আন্দোলন	ড. শত্রুঘ্ন কাহার	২৪১-২৪৭
পরিবেশগত নীতিশাস্ত্র : পরিবেশ সংরক্ষণ ভারতীয় ধর্ম এবং অনান্য সংস্কৃতির ভূমিকা	ড. উদয়ন ভট্টাচার্য	২৪৮-২৫৯

বিশনয় সম্প্রদায় ও পরিবেশ আন্দোলন

ড. শত্রুঘ্ন কাহার

ভারত একটি বৈচিত্র্যময় দেশ, যা বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাথে ভিন্ন পরিবেশগত ভূপ্রকৃতি নিয়ে গঠিত। পৃথিবীর অধিকাংশ অংশ থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া প্রজাতিগুলোকে ধরে রাখতে ভারত সক্ষম হয়েছে। ভারত বিশ্বের ১২টি মেগা জীববৈচিত্র্যপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে একটি, ভারতে এখনও অনেক মানুষ দৈনন্দিন জীবনচর্চার জন্য সরাসরি প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এবং এরা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়তা করে।[১] সেই আদিম কাল থেকে আদিবাসী উপজাতি এবং স্থানীয় সম্প্রদায় প্রকৃতির সাথে বসবাস করে এবং সাদৃশ্য বজায় রেখেছে। প্রকৃতির সাথে মানুষ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সেই আদিম কাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। আবার মানবসমাজের ক্রম উন্নতির সাথে প্রকৃতির উপর অত্যাচার ও শোষণ দুই ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যখনই এই মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে তখনই প্রকৃতি তার বদলা নিয়েছে, যার একাধিক উদাহরণ ইতিহাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যেমন নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংস হরপ্পা সভ্যতার পতন ডেকে এনেছিল। বিশ্ব জুড়ে এমন অনেক সভ্যতা আছে যার পতন ঘটেছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে। তবে ভারতে প্রকৃতির সাথে মানুষের একটা আত্মিক যোগ আছে। হরপ্পা সভ্যতা পতনের পর ভারত জুড়ে এক নতুন সভ্যতার উন্মেষ ঘটে যা আর্য সভ্যতা নামে পরিচিত। এই সভ্যতার আদিম পর্ব থেকেই বনাঞ্চল বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। আর্যদের চতুরাশ্রম জীবনচর্চার (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) গুরুত্বপূর্ণ দুটি পর্ব যথা ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস মূলত বনাঞ্চলেই অতিবাহিত হত। সুতরাং সেই প্রাচীন যুগ থেকেই বন, বনাঞ্চলের সাথে ভারতীয়দের এক আধ্যাত্মিক যোগসূত্র পাওয়া যায় যার প্রতিফলন পরবর্তীকালেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন পরবর্তীকালে চতুরাশ্রম প্রথা ক্রমশ বিলুপ্ত হলেও, গাছপালাকে কেন্দ্র করে মন্দির নির্মাণ বা গাছপালাকেই দেবতাজ্ঞানে পূজার চল আজও ভারত জুড়ে লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তীকালে ভারতের সনাতনী হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি একাধিক প্রতিবাদী ধর্মের উদ্ভব ঘটে যেমন, বৌদ্ধ, জৈন, আজীবক, চার্বক ইত্যাদি। এই সমস্ত ধর্মমতেও পরিবেশ রক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় পরবর্তী কালেও ভিন্ন ধর্মমত ও পন্থের নীতিসমূহে পরিবেশ সংরক্ষণ বিশেষভাবে স্থান পেয়ে এসেছে। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে

সমাজে লোভ, লালসার মাত্রাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক শোষণ।

বর্তমান অবস্থায় জনসংখ্যা এবং ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার সূচকীয় বৃদ্ধি তার জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিল্ডিং, রাস্তা, ট্রেন লাইন ইত্যাদি নির্মাণের মতো আরও উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে। ইতিমধ্যেই ছোট, সুরক্ষিত এলাকাগুলি আরও বেশি খণ্ডিত হচ্ছে, দেখা গেছে যে ভারতে আবাসস্থল বিভক্তকরণ ব্যাপক। ভারতে জনসংখ্যার প্রায় ৪% উপজাতি যারা প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করে। এই আদিবাসীরা পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কারণে সমস্যার সম্মুখীন হয়। ঐতিহ্যগত ভারতীয় বিশ্বাস স্থানীয় এবং আদিবাসী সম্প্রদায়কে প্রকৃতিকে সম্মান ও রক্ষা করতে পরিচালিত করেছে। এই ধরনের সম্প্রদায় আজও বিদ্যমান এবং এরকম একটি সম্প্রদায়কে হল বিশনয়।[২]

বিশ্বের বিভিন্ন অংশের পরিবেশগত আন্দোলন বিভিন্ন কারণে উদ্ভূত হয়েছে এবং তার স্থানীয় পাশাপাশি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি মেনে চলে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পরিবেশগত আন্দোলনের উত্থানের প্রধান কারণ হল প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বনাঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণের দ্বন্দ্ব। ভারতে, পরিবেশ আন্দোলনগুলি মূলত উপজাতীয়, দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগণের সাথে সম্পর্কিত, যারা বনে বাস করে, যাদের জীবিকা পরিবেশের অবক্ষয়ের দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয় এবং তারা পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার প্রধান শিকার। এই ধরনের আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে: বিশনয় আন্দোলন (১৭০০), চিপকো আন্দোলন (১৯৭৩), নীরব উপত্যকা আন্দোলন (১৯৭৮), জঙ্গল বাঁচাও আন্দোলন (১৯৮২), অ্যাপিকো আন্দোলন (১৯৮৩), নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন (১৯৮৫), তেহরি বাঁধ আন্দোলন (১৯০০) ইত্যাদি।[৩]

র

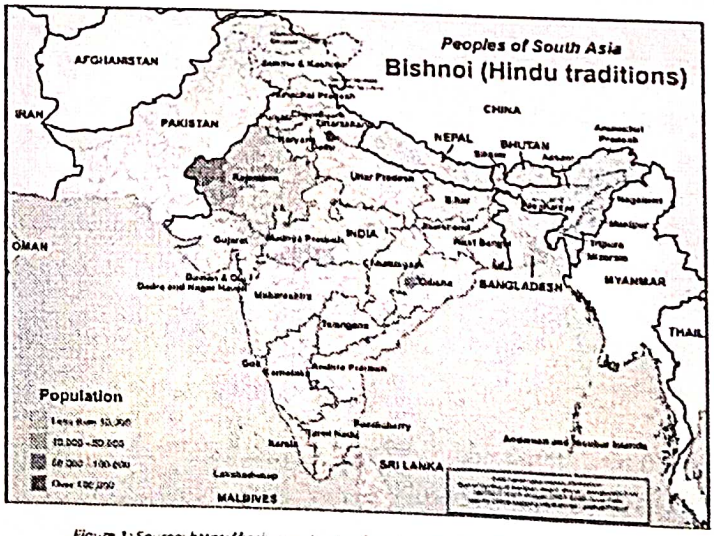

Figure 1: Source: https://joshuaproject.net/peoplegroups/16464/IN. Retrieved April 5, 2020

বিশনয় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী একটি সম্প্রদায়। তারা প্রধানত রাজস্থানে বাস করলেও গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবের কিছু পার্শ্ববর্তী রাজ্যেও তাদের উপস্থিতি বেশ নজরে পড়ে। ভারত জুড়ে মোট প্রায় ১ মিলিয়ন বিশনয় রয়েছে। তারা মূলত একটি কৃষিপ্রধান সম্প্রদায় এবং তাদের সংস্কৃতিতে প্রজাতি সংরক্ষণ ও সুরক্ষার নীতি রয়েছে।[৪] মরুভূমি অঞ্চলে বসবাস করার কারণে অতীত থেকেই তারা বৃষ্টির জল সংরক্ষণকে এবং বনাঞ্চলকে জীবনের অংশ করে তোলে। সহজ কৃষি কৌশল ব্যবহার করে তারা মরু অঞ্চলে ফসল ফলাতে দক্ষ হয়। দৈনন্দিন জীবনে তাদের কর্মধারা মরুভূমির পরিবেশগত অবস্থাকে সুস্থায়ী করতে সাহায্য করে।

গুরু জম্ভেশ্বর দ্বারা বিশনয় ধর্ম সম্প্রদায়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি ২৯টি নীতি নির্ধারণ করেছিলেন যা এই সম্প্রদায়কে অনুসরণ করতে হবে। বিশ মানে ২০ এবং নয় মানে ৯। এইভাবে, Bishnoi অনুবাদ করে ২৯। যারা ২৯টি নীতির অন্তর থেকে অনুসরণ করে তাদের বলা হবে 'বিশনয়'। বিশনয় হল পশ্চিম ভারতে বিশেষ করে রাজস্থানে প্রকৃতি উপাসকদের একটি অহিংস সম্প্রদায়।[৫]

পঞ্চদশ শতাব্দীতে এক গ্রামের বাসিন্দা জাম্ভোজি মনে করতেন যে, যোধপুরের কাছে যে খরা হয়েছে তার কারণ হল স্থানীয় মানুষ দ্বারা প্রকৃতির উপর মাত্রারিক্ত শোষণ ও অত্যাচার। এরপর তিনি 'সন্ন্যাসী' রূপে ক্রমশ পরিচিতি লাভ করেন এবং স্বামী জম্বেশ্বর মহারাজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনিই পরবর্তীকালে বিশনয় সম্প্রদায়ের সূচনা ঘটান। তিনি তার অনুগামীদের জন্য ২৯টি নীতি নির্ধারণ করেন, যার মধ্যে ছিল 'জীব দয়া পালানি' - সকল জীবের প্রতি করুণাময় হও এবং 'রুষ্ক লীলা নাহি ঘভে' - সবুজ গাছ কাটবেন না। এই নীতিগুলিতে প্রকৃতি সুরক্ষাকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি যে ২৯টি নীতির আদেশ প্রণয়ন করেছিলেন, যা একজন বিশনয় মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অনুসরণ করবেন বলে আশা করা হয়। এর মধ্যে, আটটি নীতি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পশুপালনকে উৎসাহিত করার পরামর্শ দেয়, সাতটি নীতি স্বাস্থ্যকর সামাজিক আচরণের নির্দেশনা প্রদান করে, এবং দশটি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং মৌলিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার দিকে চালিত করে। অন্য চারটি আদেশ প্রতিদিন বিষ্ণু উপাসনার জন্য নির্দেশিকা প্রদান করে। একজন বিশনয় পরিত্যক্ত প্রাণীদের আশ্রয় দেওয়ার নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করে। শুধু গাছ কাটা নিষিদ্ধ করা হয় না, তারা তাদের চারপাশের সকল বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে প্রকৃতির সকল সম্পদকে ভাগাভাগি করার একটি সুস্থায়ী ব্যবস্থাকে পাকাপাকিভাবে গড়ে তোলার যৌথ উদ্যোগ সম্প্রদায়গত রীতিতে অনুসরণ করেন। এই নীতিগুলির মধ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং মৌলিক সুস্বাস্থ্য কয়েকটি নীতি এখানে

উল্লেখ করা হল; ১) সন্তান জন্মাবার পর মা ও শিশুকে এক মাস গৃহকার্য থেকে দূরে রাখে, এতে মা বিশ্রাম পাবে এবং সহজেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে; ২) প্রতিদিন সকালে স্নান করা; ৩) শীল (প্রেম, স্নেহ, মানবতা) পালন করা; ৪) সন্তোষ বা সন্তুষ্ট থাকা; ৫) অন্তরে ও বাইরে পবিত্র জীবনযাপন করা; ৬) জল ও দুধ ছেঁকে তবেই ব্যবহার করা; ৭) ক্ষমা ও দয়াভাব ধারণ করা; চুরি না করা; ৮) মিথ্যা না বলা; ৯) বাদ-বিবাদ না করা; ১০) সব জীবের প্রতি দয়া ও লালন- পালনের মনোভাব রাখা কারণ তারাও প্রকৃতির অংশ; ১১) জীবন্ত বৃক্ষ কখনও না কাটা; ১২) কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা থেকে দূরে থাকা; ১৩) আফিম সেবন না করা; ১৪) তামাক জাতীয় দ্রব্য সেবন না করা; ১৪) ভাং সেবন না করা; ১৫) মদ্যপান না করা; ১৬) মাংস না খাওয়া। মহাত্মা গান্ধীর পরিবেশ চিন্তার ক্ষেত্রে যে যম (অহিংস, সত্য, আস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ) ও নিয়ম (শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান) পালনের কথা বলেছেন, যার মূল ভিত্তি পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গিক যোগ দর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় যোগ, তার সঙ্গে বিশনয় দর্শনের অনেক মিল রয়েছে।[৬]

এই জীবনধারায় বিপত্তি ঘটে ১৭৩০ সালে, যোধপুরে তখন রাঠোর বংশের শাসন চলছে। মাড়োয়ার রাজ্যের রাজধানী যোধপুর। এই বংশের পিতৃহন্তা মহারাজা অভয় সিং কঠোর হাতে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে শাসন পরিচালনা করছেন। কালক্রমে তাঁর মেহরানগড় দুর্গে একটি নতুন মহল তৈরি করার ইচ্ছা হয়। সেই সময় নির্মাণকার্যে সিমেন্টের ব্যবহার হত না। নির্মাণকার্যের উপকরণ হিসাবে চুন, জিপসাম, গুড়, মেথি, বাজরার মিশ্রণ ব্যবহার করা হত। এই মিশ্রণটি তৈরি করতে উপকরণগুলি একসঙ্গে মিশিয়ে দীর্ঘ সময় আগুনে জ্বাল দিতে হত। জ্বাল দেওয়ার জন্য দরকার হত প্রচুর পরিমাণ কাঠের। রাজস্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশে গাছের খুব অভাব ছিল, তাই জ্বালানি কাঠ পাওয়া খুব সহজ ছিল না। অবশেষে মন্ত্রী গিরিধর দাস ভাণ্ডারি এক রাজকর্মচারী মারফত জানতে পারলেন যে, যোধপুর থেকে ২৬ কি.মি দূরে খেজারলি নামক এক গ্রামে প্রচুর পরিমাণে খেজরি গাছ রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য খেজরি গাছের সংখ্যাধিক্যের কারণেই গ্রামের নাম হয়েছে খেজারলি। এই গ্রামে বিশনয় সম্প্রদায়ের মানুষই বেশী সংখ্যা বসবাস করত। এদের প্রধান জীবিকা পশুপালন ও কৃষিকাজ। এদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য পরিবেশের প্রতি প্রেম ও বন্যজীব সংরক্ষণ। যথারীতি রাজা তাঁর মহল নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ উক্ত গ্রাম থেকে মন্ত্রীকে নিয়ে আসার তৎক্ষণাৎ অনুমতি দেন। এদিকে জরুরিকালীন পরিস্থিতির জন্য মহারাজা অভয় সিং তার মন্ত্রী গিরিধর দাস ভাণ্ডারিকে রাজপাট চালানোর দায়িত্ব দিয়ে গুজরাটের দিকে সৈনিক অভিযানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। যাওয়ার সময়

তাড়াতাড়ি নতুন মহল তৈরি করার আদেশ দিয়ে যান। মন্ত্রী রাজানুগ্রহ পাবার আশায় আর কালবিলম্ব না করে কিছু সৈনিককে সঙ্গে করে গ্রামে পৌঁছেই গাছ কাটার আদেশ দেন। রাজার সৈন্যরা প্রথমে রামোজি খোড় এর বাড়ির পাশের খেজরি গাছ কাটা শুরু করলে আওয়াজ শুনে স্ত্রী অমৃতা দেবী তিন কন্যাসহ (আসু, রতনি, ভাগু) বাইরে বেরিয়ে এসে গাছ না কাটার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন- এই গাছ আমার পরিবারের সদস্য, আমার ভাই, আমি এঁকে রাখি পরিয়েছি, গাছকে কেন্দ্র করে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাছাড়া জীবন্ত গাছ কাটা আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ। আমি একে কাটতে দেব না। মন্ত্রী পুনরায় প্রশ্ন করলেন- তুমি বলছো এই গাছের সঙ্গে তোমাদের ধর্ম জড়িত, তাহলে এই গাছ রক্ষার্থে তোমরা কী ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত? তখন অমৃতা দেবী দীপ্ত কণ্ঠে বলেন- 'সির সাটে রুখ রহে তো ভি সাস্তো জান', অর্থাৎ আমার মাথার বদলে যদি গাছ বেঁচে যায়, তাহলে আমি তার জন্য প্রস্তুত। সূর্য ডোবার পর অন্ধকার নেমে আসায়, সেই দিন গাছ কাটার কাজ বন্ধ করে রাজকর্মচারীরা চলে যায়। কিন্তু এই খবর দাবানলের মত পার্শ্ববর্তী ৮৩টি গ্রামে ছড়িয়ে যায়।

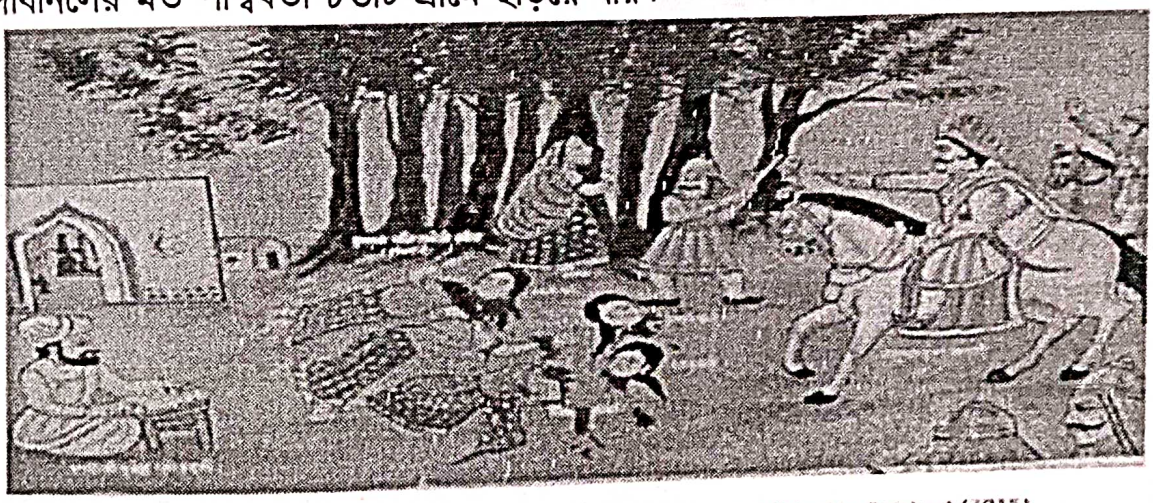

Figure 3: Painting at Khejadali Temple, artist unknown. Published in Reichert (2015)

কিছুদিন পর (২১ সেপ্টেম্বর, ১৭৩০) মন্ত্রী পুনরায় আরও বেশি সংখ্যক সৈন্য নিয়ে একেবারে প্রস্তুত হয়ে সূর্যোদয়ের আগেই গ্রামে এসে পৌঁছান। পুনরায় অমৃতা দেবী-র ঘরের সামনের খেজরি গাছ কাটা শুরু করলে আওয়াজ শুনে দৌড়ে গিয়ে তিনি গাছ কাটা বন্ধের জন্য প্রার্থনা করেন এবং বোঝান এই গাছ তাদের জীবন-জীবিকার জন্য কতটা প্রয়োজনীয়। শত অনুনয়-বিনয় করার পরেও কাজ না হওয়ায় শেষ সম্বল হিসেবে তিনি প্রিয় গাছকে জড়িয়ে ধরেন। মন্ত্রী গাছের বদলে অর্থের প্রলোভন দেখালে অমৃতা দেবীর তা অগ্রাহ্য করেন। কোনভাবেই অমৃতা দেবীকে রাজি করাতে না পেরে, মন্ত্রী

অবশেষে তাকে ভয় দেখান এবং বলেন, যদি সে গাছ কাটায় বাধা দান করে, তাহলে গাছের সঙ্গে তাকেও কেটে ফেলা হবে। কিন্তু মন্ত্রীর এ কথাও কাজে এল না। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রী অমৃতা দেবীর মাথা সমেত গাছ কেটে দেওয়ার নির্দেশ দেন। নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুড়ুলের আঘাত গিয়ে পড়ে অমৃতা দেবীর মাথায়। তৎক্ষণাৎ তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। নিজের মায়ের মৃত্যু দেখে তিন মেয়ে আশেপাশের গাছগুলিকে জড়িয়ে ধরে। মন্ত্রীর দম্ভ তাদেরকেও রেহাই দেয় না। এই খবর দ্রুত পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়লে তারাও গাছ বাঁচানোর জন্য একে একে উপস্থিত হয় এবং সারি সারি গাছগুলিকে জড়িয়ে ধরে। রাজা-মহারাজাদের সাথে সম্মুখ সমরে নামা সম্ভব না হলেও, তারা এইভাবেই শান্তিপূর্ণ ভাবে গাছকে জড়িয়ে ধরে নিজ প্রান বিসর্জন দিয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়। আর সৈনিকরা রাজাজ্ঞা পালনে এতটাই মোহগ্রস্ত ছিল যে, একে একে ৩৬৩ জনকে হত্যা করতেও তারা দ্বিধা করে না, যার মধ্যে ২৫২ জন পুরুষ এবং ১১১ জন নারী। কথিত আছে এই ঘটনা যখন রাজার কানে পৌঁছায়, তখন তিনি শোকগ্রস্ত হন। তিনি গুজরাট থেকে ফিরে এসে খেজারলি গ্রামে উপস্থিত হন। এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন, শহিদদের প্রতি তাম্রপত্রে সম্মান জানিয়ে ঘোষণা করেন- বিশনয় অধ্যুষিত অঞ্চলে আজ থেকে চিরদিনের জন্য গাছ কাটা ও বন্যপ্রাণী শিকার নিষিদ্ধ করা হল। যারা গাছ কাটবে, তাদের অপরাধী সাব্যস্ত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। রাজা অভয় সিংয়ের সেই আইন, আজও এখানে প্রযোজ্য রয়েছে। এত মৃত্যু-মিছিলের পর অবশেষে বিশনয়দের জয় হল। এই অমানবিক কৃতকার্যের জন্য শুধু মন্ত্রীকে জনসমক্ষে দোষী সাব্যস্ত করে রাজা নিজের চরিত্রকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করলেন। রাজতন্ত্রে রাজা তার প্রজাদের জীবন-জীবিকার প্রধান উৎস সম্পর্কে সত্যিই কি ওয়াকিবহাল ছিলেন না! নাকি গণতন্ত্রে সরকার যেমন আদিবাসীদের জীবন-জীবিকার জন্য জঙ্গল, পাহাড়, নদী কতটা প্রয়োজন তা জেনেও কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দিতে এক মুহূর্ত ভাবে না, সেরকম সব জেনেও না জানার ভান করার মানসিকতা কি সেই সময়েও ছিল![৭]

আজ বিশনয় সম্প্রদায়ের এই আত্মত্যাগ বিস্মৃতপ্রায়। এই সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনচর্চা প্রকৃতি ও সমাজের জন্য একটি আশার কিরণ। কিন্তু আমরা কত জনই বা এদের জীবনধারার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। গবেষণা পণ্ডিত এবং ভারতীয় গণমাধ্যম নারী পরিবেশবাদী এবং কর্মীদের হিসাবে মেধাপাটকার, অরুন্ধতী রায়, গৌরা দেবী এবং বন্দনা শিবকে আত্মত্যাগকে যতটা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তারা ততটা গুরুত্ব অমৃতা দেবী বিশনয়ের আত্মত্যাগকে দেন না। তিনি গাছ রক্ষার জন্য প্রথম আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যার ফলে যোধপুরের কাছে খেজারলি গ্রামে গাছ বাঁচানোর জন্য মানুষের

ব্যাপকভাবে এগিয়ে এসে নিজের প্রাণের বলিদান হযদিয়েছিল। ৩৬৩ জন মানুষ অমৃতা দেবী বিশনয়ের নেতৃত্বে যোধপুর রাজার সৈন্যদের হাত থেকে খেজরি গাছ রক্ষা করার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল যা তাদের পরিবেশ রক্ষার জন্য একটি সম্মিলিত সম্প্রদায়গত প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে।[৮] তাদের এই আত্মত্যাগ ইতিহাসের পাতায় নথিভুক্ত হয়ে থাকবে, আগামী প্রজন্মকে তাদের আশু কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ রাখবে বলে আশা করা যায়।

সূত্রনির্দেশ

১. Raghav Sharma, Bishnois Of India: Analysing Changes And Threats To Their Philosophies And Livelihoods, Forest and Nature Conservation Policy chair group, bishnois_of_india_analysing_changes_and_threats_t-groen_kennisnet_561143.pdf, accessed on- 12/01.2024, page- 5.

২. Op.cit.

৩. Mangilal, Research Article Bishnoi Movement of Khejarli: A Socio-Cultural Analysis, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. ISSN: 2320-5407, Int. J. Adv. Res. Published: June 2020.

৪. Raghav Sharma, op.cit, page- 6.

৫. Khabirul Alam & Dr. Ujjwal Kumar Halder, A PIONEER OF ENVIRONMENTAL MOVEMENTS IN INDIA: BISHNOI MOVEMENT, Journal of Education & Development, Vol-8, No.15, June-2018, Pp-285-86.

৬. সুরাজ পাল, বন বাঁচানোর আআন্দোলনে বিশনয় সমাজ, গতি দৈনিক, ০৬.০২.২০২১, পৃষ্ঠা - ৪, অসম।

৭. তদেব।

৮. Mangilal, op.cit.

মানুষ অমিতাচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদান-প্রদান; ক্রমে সে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে হারাল; যে তার প্রথম সুহৃদ্, দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম বহন করে এনে দিয়েছিল সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইঁটকাঠের বাসস্থান তৈরী করার জন্য। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে শ্যামলা বনলক্ষ্মী তাঁকে অবজ্ঞা করে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলে। আজকে ভারতবর্ষের উত্তর অংশ তরুবিরল হওয়াতে সে অঞ্চলে গ্রীষ্মের উৎপাত অসহ হয়েছে। অথচ পুরাণপাঠক মাত্রই জানেন যে, এককালে এই অঞ্চল ঋষিদের অধ্যুষিত মহারণ্যে পূর্ণ ছিল। উত্তর ভারতের এই অংশ এক সময় ছায়াশীতল সুরম্য বাসস্থান ছিল। মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে; প্রকৃতির সহজ দানে কুলোয়নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে। এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল অরণ্য - সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ার এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে – আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তাঁর ফল, দিন তাঁর ছায়া।

— 'অরণ্যদেবতা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।